বাংলাদেশের জনশক্তি ও জনমিতিক লভ্যাংশ: টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা

মো. খালিদ হাসান

জনমিতিক লভ্যাংশ এমন একটি সময়কে নির্দেশ করে যখন একটি দেশের জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অনুপাত হ্রাস পায়। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বলতে মূলত ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সি ব্যক্তিদের বোঝানো হয় আর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বলতে শিশু (০ থেকে ১৪ বছর) এবং বয়স্কদের (৬৫ বছর ও তার উর্ধ্ব) বিবেচনা করা হয়। সাধারণত জন্মহার হ্রাস এবং শিশুমৃত্যু হ্রাসের ফলে জনসংখ্যার গঠনগত পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় একটি দেশ জনমিতিক লভ্যাংশ যুগে প্রবেশ করে।

উনিশশত সত্তর ও আশির দশকে উচ্চ জন্মহার এবং শিশুমৃত্যুর কারণে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল অনেক বেশি। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সফলতার কারণে জন্মহার হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৬৫ শতাংশ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি বিরাট সুযোগ তৈরি করেছে। জনমিতির হিসেবে, বাংলাদেশ ২০১২ সাল থেকে জনমিতিক লভ্যাংশের যুগে প্রবেশ করে এবং তা ২০৪০ সাল পর্যন্ত বহমান থাকবে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ তার কর্মক্ষম জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে উৎপাদন, সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মাইলফলক অর্জন করা সম্ভব।

বাংলাদেশে জনমিতিক লভ্যাংশের সুফল ঘরে তুলতে হলে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় বিভিন্নখাতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো ঢেলে সাজানো জরুরি। স্বাস্থ্যখাত, শিল্পখাত, শিক্ষাখাত, কর্মসংস্থানখাত ও প্রযুক্তিখাতে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে জনশক্তি উন্নয়ন তরান্বিত করা বাঞ্ছনীয়। একটি সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা অপরিহার্য। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী, দেশে ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসক প্রতি জনসংখ্যা ১৭২৪ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্দেশনা অনুযায়ী, রোগীর সঠিক চিকিৎসাসেবায় একজন চিকিৎসকের জন্য তিনজন নার্স দরকার। কিন্তু দেশে একজন চিকিৎসকের বিপরীতে নার্সের সংখ্যা একজনেরও কম। বাংলাদেশের জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা ঘরে তুলতে হলে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে চিকিৎসক প্রতি জনসংখ্যার অনুপাত যেমন কমিয়ে আনতে হবে তেমনিভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক নার্স ও মেডিকেল টেকনিশিয়ান গড়ে তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিল্পখাতের সার্বিক উন্নতি জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগানোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তৈরি পোশাকখাতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু শুধু তৈরি পোশাক শিল্পে সীমাবদ্ধ থাকলে অর্থনীতির সুষম উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এ জন্য ইলেকট্রনিক্স, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতগুলোতে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। স্থানীয় উৎপাদন বাড়িয়ে এবং উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেশে ও বিদেশে প্রতিযোগিতামুলক বাজার তৈরি করা যেতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের একটি বড়ো অংশ তৈরি পোশাকশিল্প থেকে আসে। তবে এই নির্ভরতা অর্থনীতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন বা বিশেষ কোনো কারণে তৈরি পোশাকের চাহিদা হ্রাস পেলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ অত্যন্ত জরুরি। ওষুধ, কৃষিজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, জাহাজ নির্মাণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রসারের মাধ্যমে রপ্তানি বহুমুখীকরণ করা যেতে পারে।বাংলাদেশে অনেক পণ্য এবং সেবা আমদানি করতে হয় যা বৈদেশিক মুদ্রার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। যদি জনমিতিক লভ্যাংশের সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্থানীয় উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায় তবে আমদানির প্রয়োজনীয়তা কমবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে অনেক টেলিকম যন্ত্রাংশ ও সফটওয়্যার আমদানি করতে হয়। এ খাতে দেশীয় উৎপাদন বাড়ালে বৈদেশিক মুদ্রার চাপ কমানো সম্ভব হবে। টেলিকম খাত বাংলাদেশের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল খাত। কিন্তু এখানে প্রযুক্তিগতভাবে বাংলাদেশ অনেকটাই বিদেশ নির্ভর। বিদেশ থেকে প্রযুক্তি ও পরিষেবা আমদানি করতে হয় যা বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ সৃষ্টি করে। তাই দেশের টেলিকম সেবায় স্বনির্ভরতা বাড়ানোর জন্য গবেষণা, উন্নয়ন এবং নতুন উদ্ভাবনের প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। এই উত্তরণ দেশের জন্য গর্বের বিষয় হলেও এর সাথে কিছু চ্যালেঞ্জও যুক্ত রয়েছে। এলডিসিভুক্ত দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের অনেক পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে থাকে। এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এতে রপ্তানি খাতে প্রতিযোগিতা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এলডিসি উত্তরণের ফলে তৈরি হওয়া এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে উৎপাদন খরচ কমানো, উৎপাদনের মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানের পণ্য তৈরিতে গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করতে হবে যেখানে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা বাড়ানো যেতে পারে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক আয়ের উৎস হলো প্রবাসী জনশক্তি। বর্তমানে প্রায় ১ কোটিরও বেশি বাংলাদেশি বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন এবং তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রেরিত রেমিট্যান্স এর পরিমাণ ২১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার। প্রবাসী শ্রমশক্তির মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই স্বল্প দক্ষ। যদিও রেমিট্যান্সের প্রবাহ দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তবে প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকাংশই স্বল্প দক্ষ হওয়ার কারণে তারা স্বল্প বেতনের কাজ করতে বাধ্য হয়। এই কারণে দেশের জনশক্তি রপ্তানিতে দীর্ঘমেয়াদি লাভজনক উন্নতি করার জন্য দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা নিয়ে দেশের জনশক্তির দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। জনশক্তি উন্নয়ন কেবল রেমিট্যান্স বৃদ্ধি করে না বরং এটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখে। উন্নতমানের প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানো গেলে বিদেশি শ্রমবাজারে তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সরকার ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো যেতে পারে। বাংলাদেশে শ্রমবাজারে প্রচুর অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমিক রয়েছে যা তাদের কাজের সুযোগ সীমিত করে দেয়। এই সমস্যাটি সমাধান করতে হলে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) মতে, প্রবাসে ১০ জন অদক্ষ কর্মী যা আয় করতে পারে তার চেয়ে বেশি আয় করতে পারে তিনজন দক্ষ কর্মী। তাই সরকারকে আরও বেশি আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুসারে দক্ষতা উন্নয়নমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

এই জনশক্তির মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিশেষত সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কুয়েত ও কাতারে। নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করতে হলে দেশের জনশক্তির জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক শ্রমনীতি তৈরি করতে হবে। ইউরোপ, আমেরিকা, এবং অন্যান্য উন্নত দেশেও দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করা গেলে বৈদেশিক আয়ের সম্ভাবনা আরও বাড়বে। যেমন, জার্মানি ও জাপানের মতো দেশগুলোতে বৃদ্ধ জনসংখ্যার কারণে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে সেসব বাজারে উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ জরুরি।

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন দেশের দক্ষ জনশক্তি তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM) বিষয়ে আরও বেশি গুরুত্বারোপ করতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষিত জনশক্তির প্রচুর চাহিদা রয়েছে, যা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড়ো সুযোগ। গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন ক্ষেত্রগুলোতে দক্ষতা অর্জন করা গেলে বাংলাদেশ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় আরও ভালো অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে। উন্নত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে প্রযুক্তিনির্ভর নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব যা দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করবে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (NSDA) তথ্যমতে, দেশের ২৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে ৮২ শতাংশ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। এদের মধ্যে মাত্র ৬ দশমিক ৩ শতাংশের কোনো বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে। আর ৫৩ শতাংশ মোটামুটি দক্ষ এবং ৪০ দশমিক ৭ শতাংশ একেবারেই অদক্ষ। স্থানীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হলে কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) উপর আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) হলো এমন একটি শিক্ষা পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ শেখায় এবং তাদের বাস্তব জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করে। বর্তমান বিশ্বে কর্মমুখী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কারণ কর্মক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞান নয় বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং কারিগরি দক্ষতারও প্রয়োজন। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) সমীক্ষা মতে, ২০২৫ সাল নাগাদ দেশে বিভিন্ন খাতে মোট ৮ কোটি ৮৭ লাখ শ্রমিকের দরকার হবে। এই সময় পর্যন্ত দেশের ৯টি শিল্প খাতে নিয়োগ দিতে হবে আরও ১ কোটি ৬৬ লাখ ৮৪ হাজার নতুন শ্রমিক। এর মধ্যে দক্ষ শ্রমিক লাগবে ৮০ লাখ ও আধা দক্ষ শ্রমিক লাগবে ৫৬ লাখ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ জনগণ এখনও কৃষির সঙ্গে জড়িত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত সেচ ব্যবস্থা, জৈবসার ব্যবহার, এবং নতুন জাতের ফসলের উদ্ভাবন করার জন্য কৃষি শিক্ষার প্রসার করতে হবে। দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে স্থানীয় কৃষকদের যোগাযোগ বাড়ানো যেতে পারে। এতে কৃষকরা নতুন কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। সরকারের কৃষি নীতিমালার অংশ হিসেবে কৃষকদের জন্য সহজ ঋণ সুবিধা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর জোর দিলে রপ্তানিযোগ্য কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন সম্ভব হবে যা বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি এবং কৃষি নীতি গ্রহণ করেছে যার লক্ষ্য হলো দক্ষ ও উদ্ভাবনী জনশক্তি তৈরি করা। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিল্পনীতিতে স্থানীয় শিল্পের বিকাশ এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কৃষিনীতির লক্ষ্য হলো খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কৃষি উৎপাদন বাড়ানো।

জনমিতিক লভ্যাংশ যুগকে ফলপ্রসূ করতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতে স্থানীয় ও বৈশ্বিক চাহিদার সাথে সমন্বয় করে জনশক্তি উন্নয়নে মনযোগী হতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে পাল্লা দিয়ে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলতে হলে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা সীমিত সময়ের জন্য থাকে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর তা হ্রাস পেতে শুরু করবে এবং তখন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাই ভবিষ্যত জনমিতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এখন থেকেই সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে।

#

লেখকঃ সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

পিআইডি ফিচার